

## ষড়বিংশতি অধ্যায়

# পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

শ্লোক ১-৩

নারদ উবাচ

স একদা মহেশ্বাসৌ রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্ ।

দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাঙ্কং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্ ॥ ১ ॥

একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকুবরম্ ।

পঞ্চপ্রহরণং সপ্তবন্ধুতং পঞ্চবিক্রমম্ ॥ ২ ॥

হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্মাক্ষয়েষুধিঃ ।

একাদশচমুনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদনম্ ॥ ৩ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; সঃ—রাজা পুরঞ্জন; একদা—এক সময়; মহা-  
ইশ্বাসঃ—তাঁর বিশাল ধনুক ও বাণ নিয়ে; রথম্—রথ; পঞ্চ-অশ্বম্—পাঁচটি ঘোড়া;  
আশু-গম্—অত্যন্ত দ্রুতগামী; দ্বি-ঈষম্—দুটি বাণ; দ্বি-চক্রম্—দুটি চক্র; এক—  
একটি; অঙ্কম্—অঙ্ক; ত্রি—তিন; বেণুম্—ধ্বজদণ্ড; পঞ্চ—পাঁচ; বন্ধুরম্—বন্ধন;  
এক—এক; রশ্মি—রজ্জু, লাগাম; এক—এক; দমনম্—সারথি; এক—এক;  
নীড়ম্—উপবেশনের স্থান; দ্বি—দুই; কুবরম্—জোয়াল বাঁধার স্থান; পঞ্চ—পাঁচ;  
প্রহরণম্—অস্ত্র; সপ্ত—সাত; বন্ধুতম্—আবরণ বা শরীরের সপ্ত ধাতু; পঞ্চ—পাঁচ;  
বিক্রমম্—পস্থা; হৈম—স্বর্ণনির্মিত; উপস্করম্—অলঙ্কার; আরুহ্য—আরোহণ করে;  
স্বর্ণ—স্বর্ণনির্মিত; বর্মা—বর্ম; অক্ষয়—অক্ষয়; ইমু-ধিঃ—তৃণীর; একাদশ—একাদশ;  
চমুনাথ—সেনাপতি; পঞ্চ—পাঁচ; প্রস্থম্—লক্ষ্য; অগাৎ—গমন করেছিলেন;  
বনম্—বনে।

### অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! এক সময় পুরঞ্জন তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তুণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের গতি পঞ্চবিধ, এবং তার সম্মুখে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল।

### তাৎপর্য

এই তিনটি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীবের জড় দেহটি কিভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেহটি হচ্ছে রথ, এবং জীবাত্মা সেই রথের রথী। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতায় (২/১৩) বলা হয়েছে—*দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে। দেহের যিনি মালিক তাঁকে বলা হয় দেহী, এবং তিনি দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থিত। জীবের দেহরূপ সেই রথটি পরিচালিত হয় একজন সারথির দ্বারা। সেই রথটি তিনটি গুণের দ্বারা নির্মিত, যে-সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—যন্ত্রাকৃদানি মায়য়া। যন্ত্র শব্দটির অর্থ ‘শকট’। এই যন্ত্র বা দেহটি জড়া প্রকৃতি প্রদান করেছে, এবং সেই রথের সারথি হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই রথের রথী হচ্ছে জীবাত্মা। এটিই হচ্ছে বাস্তবিক অবস্থা।*

জীব সর্বদাই সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈঃ—জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত। এই তিনটি গুণকে এই শ্লোকে তিনটি পতাকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পতাকার মাধ্যমে বোঝা যায় রথের মালিক কে; তেমনই প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সহজেই বোঝা যায় কোন্‌দিকে সেই রথটি চলছে। অর্থাৎ, যাঁর চোখ আছে তিনি বুঝতে পারেন, প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা এই শরীর কোন্‌দিকে চলেছে। এই তিনটি শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ ধার্মিক হতে চাইলেও কিভাবে তার দেহ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্ষিতের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাজা যদিও আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, তবুও তিনি কিভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন।*



কর্মকাণ্ড অনুসারে মানুষ বেদবিহিত বিভিন্ন যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করে, এবং সেই সমস্ত যজ্ঞে পশুবলির নির্দেশ রয়েছে। যদিও যজ্ঞে পশুবলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা, তবুও পশুবলি অবশ্যই তামসিক আচার। কেবল বৈদিক শাস্ত্রেই নয়, আধুনিক অন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মের নামে এই সমস্ত পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তামসিক মানুষদের জন্যই এই পশুবলির নির্দেশ। এই সমস্ত মানুষেরা যখন পশুবলি দেয়, তখন তারা অন্তত ধর্মের নামে তা করে। কিন্তু, জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত যে ধর্ম, যেমন বৈষ্ণব-ধর্ম, সেখানে পশুবলির কোন অবকাশ নেই। এই প্রকার গুণাতীত ধর্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

“সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।” যেহেতু মহারাজ প্রাচীনবর্ষিষ্যে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন যাতে পশুবধ হচ্ছিল, তাই নারদ মুনি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই প্রকার যজ্ঞ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীমদ্ভাগবতের (১/১/২) শুরুতেই বলা হয়েছে—প্রোজ্জ্বিত-কৈতবোহত্র। যে-সমস্ত ধর্মে প্রতারণা রয়েছে, সেই সমস্ত ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেই ধর্মে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেই ভগবদ্ধর্মে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ —সমবেতভাবে এই মহামন্ত্র কীর্তনে পশুবলির কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এই তিনটি শ্লোকে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা পুরঞ্জনের বনগমন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টার প্রতীক। জড় দেহটি স্বয়ং ইঙ্গিত করে যে, জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জাগতিক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেহটি যখন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগ অত্যন্ত প্রবল হয়। যখন তা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনও তার রোগটি বেশ কঠিন। কিন্তু, দেহ যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগের উপশম হয়। শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই সত্ত্বগুণের স্তরে, কিন্তু যেহেতু এই জড় জগতে সত্ত্বগুণও কখনও



কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, তাই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও কখনও কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজা পুরঞ্জন এক সময় বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। তা জীবের তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে ইঙ্গিত করছে। রাজা পুরঞ্জন যেই বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তার নাম হচ্ছে পঞ্চপ্রস্থ। এই বনটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়কে ইঙ্গিত করে। দেহে হস্ত, পদ, উদর, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। এই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে দেহ জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করে। রথটি পাঁচটি অশ্বের দ্বারা চালিত, সেগুলি হচ্ছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অশ্বগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। রথে রাজা পুরঞ্জন দুটি বিস্ফোরক অস্ত্র রেখেছেন, সেগুলি হচ্ছে অহঙ্কার অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর’, এবং মমতা অর্থাৎ ‘এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার’।

রথের দুটি চাকা হচ্ছে পাপ ও পুণ্য। রথটি তিনটি পতাকার দ্বারা সজ্জিত, যেগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতীক। পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধক হচ্ছে দেহাভ্যন্তরের পাঁচটি বায়ুর প্রতীক। সেগুলি হচ্ছে—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। দেহটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সাতটি আবরণ হচ্ছে—চর্ম, মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত, অস্থি ও শুক্র। জীব তিনটি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদানের দ্বারা আবৃত। এগুলি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে জীবের প্রতিবন্ধক।

এই শ্লোকে রশ্মি (‘রজ্জু’) শব্দটি মনকে ইঙ্গিত করে। নীড় শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নীড় শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাখির বাসা। এখানে নীড় হচ্ছে হৃদয়, যেখানে জীবাত্মা অবস্থিত। জীবাত্মা কেবল এক স্থানে বসে থাকে। তার বন্ধনের কারণ দুটি—শোক ও মোহ। এই জড় জগতে জীব সর্বদা সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, যা সে কখনই পেতে পারে না। তাই তা হচ্ছে মোহ। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার ফলে, জীব সর্বদা শোক করে। তাই শোক ও মোহকে এখানে দ্বিকুবর বা বন্ধনের দুটি দণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীব পাঁচটি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা তার বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করে, যেগুলি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। স্বর্ণ অলঙ্কার ও শয্যা হচ্ছে জীবের রজো গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রতীক। যার কাছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে, সে বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ এই



জড় জগতে কত কিছু ভোগ বাসনা করে। এগারজন সেনাপতি হচ্ছে দশটি ইন্দ্রিয় ও মন। মন সর্বদা দশজন সেনাপতির সঙ্গে পরিকল্পনা করে, কিভাবে জড় জগৎকে উপভোগ করা যায়। পঞ্চপ্রস্থ নামক যে বনে রাজা মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তা হচ্ছে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ের বন। এইভাবে এই তিনটি শ্লোকে নারদ মুনি জড় দেহ এবং তার মধ্যে জীবের বদ্ধ অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

### শ্লোক ৪

চচার মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আভেষুকামুকঃ ।

বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যাসনলালসঃ ॥ ৪ ॥

চচার—সম্পাদন করেছিলেন; মৃগয়াম্—শিকারে; তত্র—সেখানে; দৃপ্তঃ—গর্বিত হয়ে; আভ—গ্রহণ করে; ইষু—বাণ; কামুকঃ—ধনুক; বিহায়—পরিত্যাগ করে; জায়াম্—তাঁর পত্নীকে; অ-তৎ-অর্হাম্—যদিও অসম্ভব; মৃগ—শিকারে; ব্যাসন—পাপকর্ম; লালসঃ—অনুপ্রাণিত হয়ে।

### অনুবাদ

যদিও রাজা পুরঞ্জনের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সঙ্গ ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল, তবুও, মৃগয়া করার বাসনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন।

### তাৎপর্য

এক প্রকার শিকার হচ্ছে স্ত্রী-শিকার। বদ্ধ জীব কখনই এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট হয় না। যাদের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত অসংযত, বিশেষ করে তারা বহু স্ত্রী শিকার করার চেষ্টা করে। রাজা পুরঞ্জন যে তাঁর ধর্মপত্নীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তা বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বহু রমণী-শিকার করার চেষ্টার প্রতীক। রাজা যেখানেই যান না কেন, সব সময় তাঁর মহিষীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু রাজা বা বদ্ধ জীব যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন আর তার ধর্মনীতির কথা মনে থাকে না। পক্ষান্তরে সে তখন মহাগর্বে আসক্তি ও বিরক্তিরূপ ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে। আমাদের চেতনা সর্বদাই এই দুইভাবে কাজ করছে—ঠিকভাবে এবং ভুলভাবে। মানুষ যখন



রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মর্যাদার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তখন সে ঠিক পথ পরিত্যাগ করে ভুল পথ গ্রহণ করে। ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও কখনও বনে গিয়ে হিংস্র পশুদের বধ করার উপদেশ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা কিভাবে বধ করতে হয় তা শিখতে পারেন। তার উদ্দেশ্য কখনই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নয়। পশুমাংস আহার করার জন্য পশুহত্যা করা মানুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

### শ্লোক ৫

আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ ।

ন্যহননিশিতৈর্বানৈর্বনেষু বনগোচরান্ ॥ ৫ ॥

আসুরীম্—আসুরিক; বৃত্তিম্—বৃত্তি; আশ্রিত্য—অবলম্বন করে; ঘোর—ভয়ঙ্কর; আত্মা—চেতনা, হৃদয়; নিরনুগ্রহঃ—নির্দয়; ন্যহনৎ—হত্যা করেছিলেন; নিশিতৈঃ—তীক্ষ্ণ; বানৈঃ—বাণের দ্বারা; বনেষু—বনে; বন-গোচরান্—বন্য পশুদের।

### অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন তখন আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নির্বিচারে বনের বহু নিরীহ পশু বধ করেছিলেন।

### তাৎপর্য

মানুষ যখন তার পদগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তখন সে রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অসংযতভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে এখানে আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ যখন আসুরিক ভাবাপন্ন হয়, তখন নিরীহ পশুদের প্রতি তার কোন রকম দয়া থাকে না। তার ফলে তারা পশুহত্যা করার জন্য বিভিন্ন কসাইখানা খোলে। তাকে বলা হয় সূনা বা হিংসা, অর্থাৎ জীব হত্যা। কলিযুগে রজ ও তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সমস্ত মানুষেরাই আসুরিক হয়ে গেছে; তাই পশুমাংস আহার তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন প্রকার কসাইখানা খুলেছে।

এই কলিযুগে দয়ার বৃত্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। তার ফলে মানুষে-মানুষে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে। মানুষেরা বোঝে না যে, যেহেতু তারা অবাধে



পশুহত্যা করছে, তাই তারাও মহাযুদ্ধে পশুর মতো বলি হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কসাইখানায় অবাধে পশুহত্যা হচ্ছে, এবং তার ফলে প্রতি পাঁচ-দশ বছর অন্তর মহাযুদ্ধ হয়, যাতে অসংখ্য মানুষ পশুর থেকেও নিষ্ঠুরভাবে বধ হয়। কখনও কখনও যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা তাদের শত্রুদের বন্দিশিবিরে রাখে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করে। এটি হচ্ছে কসাইখানায় অথবা জঙ্গলে অবাধে পশুহত্যা করার প্রতিক্রিয়া। গর্বাক্ত ও আসুরিক মানুষেরা প্রকৃতির নিয়ম অথবা ভগবানের আইন জানে না। তাই তারা কোন রকম বিবেচনা না করে, অবাধে নিরীহ পশুদের হত্যা করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশুহত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই আন্দোলনে সদস্যদের চারটি নিয়ম পালন করার প্রতিজ্ঞা করতে হয়; সেগুলি হচ্ছে—পশুহত্যা বর্জন, সব রকম নেশা বর্জন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন এবং জুয়া-পাশা ইত্যাদি খেলা বর্জন। এই চারটি নিয়ম পালন না করলে, এই সংস্থার সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় না। কলিযুগের মানুষদের পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন।

### শ্লোক ৬

তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্ পশূন্ বনে ।

যাবদর্থমলং লুক্কো হন্যাদিতি নিয়ম্যতে ॥ ৬ ॥

তীর্থেষু—তীর্থস্থানে; প্রতিদৃষ্টেষু—বেদের নির্দেশ অনুসারে; রাজা—রাজা; মেধ্যান্—বলি দেওয়ার যোগ্য; পশূন্—পশুদের; বনে—বনে; যাবৎ—যতখানি; অর্থম্—প্রয়োজন; অলম্—তার থেকে অধিক নয়; লুক্কো—লোভবশত; হন্যাৎ—হত্যা করতে পারে; ইতি—এইভাবে; নিয়ম্যতে—নিয়ন্ত্রিত।

### অনুবাদ

রাজা যদি মাংস আহারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে বনে গিয়ে, কেবল বধ্য পশুদের হত্যা করতে পারেন। অনর্থক ও অবাধে পশুহত্যা কখনই অনুমোদিত হয়নি। রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মূর্খ মানুষেরা যাতে অসংযতভাবে অবাধে পশুহত্যা না করে, সেই জন্যই বেদে পশুবধের সুনিয়ন্ত্রিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



### তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের ব্যাপারে কেন জীবকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। রাজা যদি হত্যা করার কৌশল শিক্ষা লাভের জন্য বনে গিয়ে পশুহত্যা করতে পারে, তা হলে ইন্দ্রিয়-সম্বিত জীবদের কেন অবাধে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে দেওয়া হবে না? আজকাল তথাকথিত সমস্ত স্বামী ও যোগীরাও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করছে যে, যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাই ইন্দ্রিয় সুখভোগের মাধ্যমে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করতে হবে। এই সমস্ত মূর্খ স্বামী ও যোগীরা কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। কখনও কখনও এই সমস্ত মূর্খেরা শাস্ত্রের বিরোধিতা পর্যন্ত করে। তারা প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের কাছে ঘোষণাও করে যে, শাস্ত্রগ্রন্থের কোন আবশ্যকতা নেই। তারা বলে, “তোমরা আমার কাছে এসো, এবং আমি তোমাদের স্পর্শ করলেই, তোমরা তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে।”

যেহেতু আসুরিক ব্যক্তির প্রতারিত হতে চায়, তাই তাদের প্রতারণা করার জন্য বহু প্রতারক এসেছে। এই কলিযুগের বর্তমান সময়ে, সমগ্র মানব-সমাজ প্রতারক ও প্রতারিতের সমাজে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য বৈদিক শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় সুখভোগের যথাযথ পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। এই যুগে সকলেই প্রায় মাছ-মাংস খেতে চায়, মদ্যপান করতে চায় এবং মৈথুনসুখ উপভোগ করতে চায়, তাই বৈদিক শাস্ত্রে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ করার, মা কালীর কাছে যথাযথভাবে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুমাংস আহার করার এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আসবপান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে নিয়ম্যতে শব্দটি সেই কথাই ইঙ্গিত করে—পশু হত্যা, আসবপান ও স্ত্রীসঙ্গ—সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করা উচিত।

নিয়ম মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। রাস্তায় পরিবহণের নিয়ম মানুষদের বলে দেয়, রাস্তার ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে থাকতে। এই নিয়ম কেবল মানুষদের জন্য, তা পশুদের জন্য নয়। কোন পশু যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তা হলে তাকে কখনও দণ্ড দেওয়া হয় না, কিন্তু কোন মানুষ যদি তা করে, তা হলে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। বেদ পশুদের জন্য নয়, মানুষদের উপলব্ধির জন্য। কোন মানুষ যদি কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করে বেদের বিধি-নিষেধগুলি লঙ্ঘন করে, তা হলে যথাসময় তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। তাই কাম-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বেদের নির্দেশ অনুসারে নিজেদের সংযত করা উচিত। রাজাকে যে বনে গিয়ে পশুহত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য নয়। হত্যা করার কলা নিয়ে আমরা কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি না। রাজা যদি চোর ও বদমাশদের



সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ভয় পায়, এবং ঘরে বসে আরামে নিরীহ পশুদের হত্যা করে তাদের মাংস আহার করে, তা হলে সে অবশ্যই তার পদ থেকে বিচ্যুত হবে। যেহেতু এই যুগে রাজারা এইভাবে আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, তাই প্রকৃতির নিয়মে প্রতিটি দেশেই রাজতন্ত্র লোপ পেয়েছে।

এই যুগে মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, একদিক দিয়ে তারা বহু বিবাহ বন্ধ করেছে এবং অন্য দিকে তারা কতভাবে স্ত্রী শিকার করেছে। বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে, অমুক ক্লাবে অথবা অমুক দোকানে অর্ধনগ্ন যুবতী পাওয়া যায়। এইভাবে যুবতীরা আধুনিক সমাজের ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বেদের নির্দেশ অনুসারে, কোন মানুষের যদি একাধিক স্ত্রী উপভোগ করার প্রবণতা থাকে, যা অনেক সময় উচ্চতর বর্ণের মানুষদের মধ্যে দেখা যায়, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এমন কি কখনও কখনও শূদ্রদের মধ্যেও, তখন তাকে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিবাহের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, লাম্পাট্য পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে লাম্পাট্য অনিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও সমাজে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যে, মানুষ একজনের বেশি পত্নী বিবাহ করতে পারবে না। এটিই হচ্ছে আদর্শ আসুরিক সমাজ।

### শ্লোক ৭

য এবং কর্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুবীত মানবঃ ।

কর্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যঃ—যিনি; এবম্—এইভাবে; কর্ম—কার্য; নিয়তম্—নিয়ন্ত্রিত; বিদ্বান্—বিদ্বান্; কুবীত—করা উচিত; মানবঃ—মানুষ; কর্মণা—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; তেন—এর দ্বারা; রাজ-ইন্দ্র—হে রাজন্; জ্ঞানেন—জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা; ন—কখনই না; সঃ—তিনি; লিপ্যতে—লিপ্ত হন।

### অনুবাদ

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্ষিষৎকে বলতে লাগলেন—হে রাজন্! যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তিনি কখনও সকাম কর্মে লিপ্ত হন না।



### তাৎপর্য

সরকার যেমন নাগরিকদের বিশেষভাবে কার্য করার জন্য বাণিজ্যিক অনুমতি (Trade Licenses) প্রদান করেন, তেমনই আমাদের সমস্ত সকাম কর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করার জন্য বেদে নানা প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জীবই এই জড় জগতে এসেছে উপভোগ করার জন্য। তাই এই উপভোগ করার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বেদ প্রদান করা হয়েছে। যিনি বৈদিক বিধান অনুসারে তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তিনি কখনও তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৩/৯) বলা হয়েছে, যজ্ঞার্থং কর্মণঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য অথবা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। অন্যত্র লোকহয়ম্ কর্মবন্ধনঃ—তা না হলে যে-কোন কর্মই ফল উৎপাদন করবে, যার দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়ে পড়বে। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন বৈদিক বিধিনিষেধ অনুসারে এমন ভাবে কর্ম করেন, যাতে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই প্রকার নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্মকে বলা হয় জ্ঞান। বাস্তবিকপক্ষে, বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘জ্ঞান’। জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, বৈদিক নিয়ম অনুসরণ করার ফলে, মানুষ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাই দায়িত্বহীনভাবে আচরণ না করে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার জন্য সকলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি যখন সরকারের আইন এবং অনুমোদন অনুসারে কর্ম করে, তখন সে কোন অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে না। মানুষের তৈরি আইন অবশ্য সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ, কারণ মানুষের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু বৈদিক নির্দেশগুলি তেমন নয়, কারণ সেগুলি এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। বৈদিক নির্দেশে কোন ত্রুটি থাকতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে প্রাপ্ত, এবং তাই তাতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অশ্রান্ত, কারণ তা পরম্পরার ধারায় সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১) বলা হয়েছে—তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে আদিকবি, তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশ প্রদান করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই বৈদিক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, ব্রহ্মা পরম্পরার ধারায় নারদকে



সেই জ্ঞান দান করেছিলেন, এবং নারদ তা ব্যাসদেবকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। আমরা যদি বৈদিক জ্ঞান অনুসারে আচরণ করি, তা হলে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

### শ্লোক ৮

অন্যথা কর্ম কুর্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে ।

গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥ ৮ ॥

অন্যথা—তা না হলে; কর্ম—সকাম কর্ম; কুর্বাণঃ—করার সময়; মান-আরুঢ়ঃ—অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়ে পড়ে; গুণ-প্রবাহ—জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবের দ্বারা; পতিতঃ—অধঃপতিত; নষ্ট-প্রজ্ঞঃ—বুদ্ধি ভ্রষ্ট; ব্রজতি—গমন করে; অধঃ—নিম্নে।

### অনুবাদ

আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবে অধঃপতিত হয়, এবং এইভাবে প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ফলে জীব তার প্রকৃত বুদ্ধি বর্জিত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এইভাবে সে মলের কীটাপু থেকে গুরু করে, ব্রহ্মলোকে অতি উন্নত পদ পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে।

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে বহু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে অন্যথা, যা বৈদিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করে না যারা, তাদের ইঙ্গিত করছে। বেদের বিধি-নিষেধগুলিকে বলা হয় শাস্ত্রবিধি। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা এই শাস্ত্রবিধি স্বীকার না করে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, এমন কি সুখী হতে পারে না অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

“যারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সুখী হতে পারে না এবং পরম গতি লাভ করতে



পারে না।” (ভগবদ্গীতা ১৬/২৩) এইভাবে যারা জেনে শুনে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে, তারা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই মানব-সমাজের কর্তব্য বৈদিক বিধি-নিষেধগুলি পালন করা, যার সারমর্ম ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তা না হলে, এই ভবসাগর থেকে কখনও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, আত্মা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করেছে। জীবনের ক্রম-বিবর্তনের ফলে, জীব যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যাশা করা হয় যে, সে বৈদিক নির্দেশগুলি পালন করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, অনাদিকাল ধরে জীব ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আসুরিক প্রবৃত্তির জন্য জড় জগতে ত্রিতাপ দুঃখভোগ করছে। শ্রীকৃষ্ণও সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃস্বৰ্ণানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কথতি ॥

“এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা আমার শাস্বত অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে।” প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে ত্রিতাপ দুঃখভোগ করার কোন কারণই তার নেই, কিন্তু ভোক্তা হওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে, সে স্বেচ্ছায় এই বন্ধন স্বীকার করেছে। সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ভগবান ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র দান করেছেন। তাই বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

“শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জীব বহির্মুখ হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ দিচ্ছে।” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।

জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

“জীব যখন মায়ার শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে নিজে-নিজে তার কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে পারে না। তাই কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ তাকে চতুর্বেদ এবং অষ্টাদশ পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন।” (চৈ চঃ মধ্য ২০/১২২) তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশের সদ্যবহার করা; তা না হলে,



সে তার খেয়াল-খুশিমতো কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এই শ্লোকে মানারূঢ়ঃ শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মস্ত বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার অছিলায়, সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষেরা তাদের মানসিক স্তরে কার্য করেছে। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে দেওয়া ভগবানের নির্দেশের কোন গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে, এই সমস্ত মানুষেরা হচ্ছে অভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২) তাই বলা হয়েছে—

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কোন সদগুণ থাকতে পারে না, কারণ তারা মানসিক স্তরে কার্য করে। যারা মানসিক স্তরে কার্য করে, তাদের সময়ে সময়ে জ্ঞানের মান পরিবর্তন করতে হয়। আমরা তাই দেখতে পাই যে, একজন দার্শনিকের সঙ্গে অন্য দার্শনিকের মতের মিল হয় না, এবং একজন বৈজ্ঞানিক অন্য আর একজন বৈজ্ঞানিকের মতবাদের বিরোধিতা করে তার মতবাদ উপস্থাপন করে। প্রকৃত জ্ঞানরহিত হয়ে মনোধর্মের স্তরে কার্য করার ফলে, এই সব হয়। কিন্তু বেদের উপদেশের মাধ্যমে আমরা আদর্শ জ্ঞানলাভ করতে পারি। বেদের বাণী কখনও কখনও পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও তা অপ্রাস্ত। যেহেতু বেদ হচ্ছে জ্ঞানের আদর্শ মান, আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও তাদের পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও, তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা উচিত। কেউ যদি তা স্বীকার না করে, তা হলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

এই শ্লোকে জড়-জাগতিক পরিস্থিতিকে গুণ-প্রবাহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই জড় জগৎ প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রবাহস্বরূপ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই তাঁর একটি গানে বলেছেন, মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুড়বু, ভাই—“তুমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছ কেন? কেন তুমি কখনও সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে নিমজ্জিত হচ্ছ এবং কখনও জলের উপর ভেসে উঠছ?” জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস, করলে ত আর দুঃখ নাই—“তুমি যদি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে গ্রহণ করতে পার, তা হলে তুমি এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারবে।” জীব যখনই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে আদর্শ জ্ঞান গ্রহণ করে, যা ভগবদ্গীতায় যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং তখন আর সে অধঃপতিত হয়ে সেই জ্ঞান হারায় না।



নষ্ট-প্রজ্ঞঃ। প্রজ্ঞা মানে ‘পূর্ণ জ্ঞান’, এবং নষ্ট-প্রজ্ঞা মানে হচ্ছে ‘যার পূর্ণ জ্ঞান নেই’। যার পূর্ণজ্ঞান নেই, সে কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা করে। এই প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনার ফলে, মানুষ নারকীয় অবস্থায় অধঃপতিত হতে থাকে। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করলে, হৃদয় কখনও নির্মল হয় না। হৃদয় যদি নির্মল না হয়, তা হলে জীব প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে কর্ম করে। সেই সমস্ত কর্ম ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের এক থেকে ছয় শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (২/৪৫) আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্যো ভবার্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

“বেদে প্রধানত জড় প্রকৃতির তিন গুণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। হে অর্জুন! তুমি সেই সমস্ত গুণের অতীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব থেকে এবং লাভ ও সুরক্ষার সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হও, এবং আত্মায় অবস্থিত হও।” সারা জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক জ্ঞান প্রকৃতির এই তিন গুণের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত গুণগুলি অতিক্রম করা কর্তব্য, এবং সেই নিগুণ স্তর প্রাপ্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে মানুষ তার জীবন সার্থক করতে পারে। তা না হলে, সে তিন গুণের তরঙ্গের আঘাতে সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। সেই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/৩০) প্রহ্লাদ মহারাজের বার্তাতে স্পষ্টীকৃত হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা

মিথোহভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।

অদাস্তগোভির্ষিতাং তমিষং

পুনঃ পুনশ্চর্বিচর্বণানাম্ ॥ .

জড় সুখভোগের চেষ্ঠায় গভীরভাবে যুক্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির তাদের জড় অভিজ্ঞতার অতীত আর কিছুই জানে না, এবং তারা প্রকৃতির তরঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাদের সুখভোগের প্রচেষ্টা চর্বিত বস্তু চর্বণ করার মতো, এবং তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এইভাবে তারা নারকীয় জীবনের অন্ধতম প্রদেশে অধঃপতিত হয়।

### শ্লোক ৯

তত্র নির্ভিন্নগাত্রানাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ ।

বিপ্লবোহভূদ্দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৯ ॥



তত্র—সেখানে; নির্ভিন্ন—বিদ্ধ হয়ে; গাত্রাণাম্—শরীর; চিত্র-বাজৈঃ—বিভিন্ন প্রকার পালক-সমন্বিত; শিলী-মুখৈঃ—বাণের দ্বারা; বিপ্লবঃ—ধ্বংস; অভূৎ—করা হয়েছিল; দুঃখিতানাং—অত্যন্ত দুঃখিতদের; দুঃসহঃ—অসহ্য; করুণ-আত্মনাম্—যাঁরা অত্যন্ত দয়ালু তাঁদের জন্য।

### অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন যখন এইভাবে শিকার করছিলেন, তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে, সেই বনের বহু পশু অসহ্য বেদনায় তাদের প্রাণ ত্যাগ করেছিল। রাজার এই বীভৎস বিনাশকার্য দর্শন করে, দয়ালু ব্যক্তির অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রকার হত্যাকাব্য দর্শন করে সহ্য করতে পারেননি।

### তাৎপর্য

আসুরিক মানুষেরা যখন পশুহত্যা করে, তখন দেবতা বা ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। আধুনিক যুগের আসুরিক সভ্যতা সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ধরনের কসাইখানা খুলেছে। সমস্ত ভগু স্বামী ও যোগীরা মূর্খ মানুষদের পশুহত্যা করে তাদের মাংস আহার করতে অনুপ্রাণিত করছে এবং সেই সঙ্গে তাদের তথাকথিত ধ্যান ও যোগ অভ্যাস করে যেতে বলছে। এই সমস্ত কার্য অত্যন্ত বীভৎস, এবং তা দর্শন করে স্বাভাবিকভাবে দয়ালু ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। শিকার করার পন্থাও বিভিন্নভাবে চলছে, যা আমরা ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করেছি। নারী শিকার, বিভিন্ন প্রকার সুরাপান, নেশাগ্রস্ত হওয়া, পশু হত্যা করা এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ—এই সবই আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। পৃথিবীর এই অবস্থা দর্শন করে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং তাই তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করতে অত্যন্ত ব্যস্ত হন।

বনে পশু বধ হতে দেখে, কসাইখানায় অসংখ্য পশুহত্যা হতে দেখে, এবং বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটি নামক বেশ্যালয়ে যুবতী মেয়েদের অন্যায়ভাবে ভোগ করতে দেখে, ভগবদ্ভক্তরা অত্যন্ত ব্যথিত হন। যজ্ঞে পশুহত্যা হতে দেখে মহর্ষি নারদ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং কৃপাপরবশ হয়ে তিনি রাজা প্রাচীনবর্ষিষৎকে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর এই উপদেশের মাধ্যমে, নারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, মানব-সমাজে প্রচলিত এই প্রকার বধের ফলে, তাঁর মতো ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হন। এই প্রকার হত্যাকাব্যের ফলে কেবল সাধু ব্যক্তিরাই দুঃখিত হন না, এমনকি ভগবান স্বয়ং দুঃখিত হয়ে বুদ্ধদেবরূপে অবতরণ করেছিলেন। জয়দেব গোস্বামী তাই গেয়েছেন—



সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ । যজ্ঞের নামে পশুহত্যা হতে দেখে, ভগবানের সদয় হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল, এবং সেই পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য তিনি কৃপাপূর্বক বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কখনও কখনও কিছু মূর্খ মানুষেরা বলে যে, পশুদের আত্মা নেই, অথবা তারা পাথরের মতো জড়। এইভাবে তারা যুক্তি প্রয়োগ করে যে, পশুহত্যার ফলে কোন পাপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে পশুরা পাথরের মতো জড় নয়, বরং যারা পশুদের হত্যা করে, তারা পাথরের মতো কঠিন হৃদয়। তাই কোন যুক্তি অথবা দর্শন তাদের মর্মকে স্পর্শ করতে পারে না। তারা কসাইখানাগুলি চালিয়ে যেতে থাকে এবং বনে পশুহত্যা করতে থাকে। মূল কথা হচ্ছে যে, যারা নারদ মুনির মতো মহাত্মা এবং তাঁর পরম্পরার উপদেশ গ্রাহ্য করে না, তারা অবশ্যই নষ্টপ্রজ্ঞ এবং তাদের অপকর্মের ফলে তারা নরকগামী হচ্ছে।

### শ্লোক ১০

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ কৃষ্ণশল্যকান্ ।

মেধ্যানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বিনিঘ্নন শ্রমমধ্যগাৎ ॥ ১০ ॥

শশান্—শশক; বরাহান্—শূকর; মহিষান্—মহিষ; গবয়ান্—গবয়; কৃষ্ণ—কৃষ্ণসার মৃগ; শল্যকান্—শজারু; মেধ্যান্—যজ্ঞের উপযুক্ত পশু; অন্যান্—অন্য; চ—এবং; বিবিধান্—বিভিন্ন; বিনিঘ্নন—হত্যা করে; শ্রমম্ অধ্যগাৎ—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন।

### অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন বহু শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, কৃষ্ণসার মৃগ, শজারু এবং শিকার করার উপযুক্ত অন্যান্য পশু সংহার করে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

### তাৎপর্য

তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষেরা নানা প্রকার পাপকর্ম করে। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থে, শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, অজ্ঞানের ফলেই মানুষ পাপকর্ম করে। পাপকর্মের পরিণাম হচ্ছে দুঃখ-কষ্ট ভোগ। যারা অজ্ঞান, যারা আইন লঙ্ঘন করে, তারা রাষ্ট্রের আইন অনুসারে দণ্ডভোগ করে। তেমনই, প্রকৃতির আইনও অত্যন্ত কঠোর। একটি শিশু যদি অজ্ঞানতাবশত আগুনে হাত দেয়, তা হলে যদিও সে একটি শিশু, তবুও তার হাত পুড়ে যায়। একটি শিশুও যদি



প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, তা হলেও প্রকৃতি তাকে করুণা করে না। অজ্ঞানের বশেই কেবল মানুষ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, এবং সে যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন আর সে পাপকর্ম করে না।

বহু পশু বধ করে রাজা পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। মানুষ যখন সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন সে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে অবগত হয় এবং তার ফলে ধর্মপরায়ণ হয়। অধার্মিক ব্যক্তির পশুর মতো, কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সেই প্রকার মানুষেরাও চেতনা লাভ করে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, দ্যুতক্রীড়া ও আসবপান এই চারটি পাপকর্ম বর্জন করেছে। এটিই হচ্ছে ধার্মিক জীবনের শুরু। তথাকথিত যে-সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তির এই চারটি নিয়ম পালন করে না, তারা ভণ্ড। ধর্ম জীবন ও পাপকর্ম একসঙ্গে চলাতে পারে না। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ধার্মিক জীবন অথবা মুক্তির পথ অবলম্বন করতে চান, তা হলে তাঁকে এই চারটি বিধিনিষেধ পালন করতেই হবে। মানুষ যতই পাপী হোক না কেন, সে যদি সদগুরুর কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তার পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করে তা করা বন্ধ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়। তা সম্ভব হয় কেবল শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন করার ফলে এবং সদগুরুর নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে।

এখন সারা পৃথিবী অন্ধ জড় সভ্যতা থেকে অবসর গ্রহণে আগ্রহী হতে চলেছে। এই অন্ধ জড় সভ্যতাকে বনে পশু-শিকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে, হত্যা করার ক্রেশদায়ক জীবন পরিত্যাগ করা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পশু-ঘাতকদের বাঁচা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়। তারা যদি কেবল পশুহত্যা করার জন্য এবং স্ত্রী সন্তোগ করার জন্য বেঁচে থাকে, তা হলে সেই জীবনে কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়। আর পশু-ঘাতককে তার মৃত্যুর পর নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেটিও বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, হত্যাকারীদের হত্যা করার বৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, তাদের জীবনকে সার্থক করা উচিত। উদ্ভ্রান্ত ও নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে কখনও তার নৈরাশ্য ও বেদনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না, কারণ আত্মহত্যা করার ফলে, তাকে নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় অথবা স্থূল জড় দেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, ভূতপ্রেত হয়ে থাকতে হয়। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়ে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করে মানুষ তার প্রকৃত আলায় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।



## শ্লোক ১১

ততঃ ক্ষুভ্ৰূটপরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্ ।

কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ—তার পর; ক্ষুৎ—ক্ষুধার দ্বারা; ভূট—তৃষ্ণা; পরিশ্রান্তঃ—অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে; নিবৃত্তঃ—বিরত হয়ে; গৃহমেয়িবান্—তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; কৃত—করে; স্নান—স্নান; উচিত-আহারঃ—উপযুক্ত খাদ্য; সংবিবেশ—বিশ্রাম করেছিলেন; গতক্লমঃ—শ্রান্তি দূর করেছিলেন।

## অনুবাদ

তার পর রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তাঁর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে আসার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং উপযুক্ত খাদ্য আহার করেছিলেন। তার পর তিনি বিশ্রাম করে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি দূর করেছিলেন।

## তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষ সারা সপ্তাহ ধরে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে। সে সব সময় অনুসন্ধান করে, “কোথায় টাকা? কোথায় টাকা?” তার পর, সপ্তাহ শেষে, সে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করতে চায়। রাজা পুরঞ্জুন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কারণ তিনি বনে মৃগয়া করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর বিবেক তাঁকে আরও পাপকর্ম করা থেকে বিরত করে, তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ভগবদ্গীতায় বিষয়াসক্ত মানুষদের দুষ্কৃতিঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে। মানুষের যখন চৈতন্যের উদয় হয় এবং বুঝতে পারে যে, সে পাপকর্ম করছে, তখন সে তার চেতনায় ফিরে আসে, যাকে এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় প্রাসাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত বিষয়াসক্ত মানুষেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। রজ এবং তমোগুণের পরিণাম হচ্ছে কাম ও লোভ। বিষয়াসক্ত মানুষদের কার্যকলাপের অর্থ হচ্ছে কাম ও লোভের জন্য কর্ম। কিন্তু তাদের যখন চৈতন্য হয়, তখন তারা অবসর গ্রহণ করতে চায়। বৈদিক সভ্যতায় এই প্রকার অবসরের প্রশংসা করা হয়েছে, এবং জীবনের সেই অবস্থাকে বলা হয় বানপ্রস্থ। যে-সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পাপময় জীবন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের পক্ষে অবসর গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।



রাজা পুরঞ্জন গৃহে ফিরে এসে স্নান করেছিলেন এবং উচিত আহার করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, বিষয়াসক্ত মানুষদের পাপকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে পবিত্র হওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে নবীনতা অনুভব করবেন, ঠিক যেভাবে স্নানের পর অনুভব হয়। সৎগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করা উচিত, যথা—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, দ্যুতক্রীড়া ও আমিষাহার।

এই শ্লোকে উচিতাহারঃ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। উচিত মানে ‘উপযুক্ত’। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত খাদ্য আহার করা এবং শূকরের মতো বিষ্ঠা ভোজন করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় (১৭/৮) মানুষের আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজসিক ও তামসিক আহার করা মানুষের উচিত নয়। তাকে বলা হয় উচিতাহার বা উপযুক্ত আহার। যারা সর্বদা আমিষ আহার করেছে বা সুরাপান করেছে, যা হচ্ছে রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত খাদ্য ও পানীয়, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি বর্জন করা, যাতে তার প্রকৃত চেতনা জাগরিত হতে পারে। এইভাবে মানুষ শান্তিলাভ করতে পারে এবং নবীনতা অনুভব করতে পারে। কেউ যদি অশান্ত অথবা পরিশ্রান্ত থাকে, তা হলে সে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/২০) বলা হয়েছে—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিয়োগতঃ ।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে, প্রসন্ন হওয়া যায় না, এবং প্রসন্ন না হতে পারলে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পুরঞ্জনের গৃহে প্রত্যাবর্তন কৃষ্ণভাবনামৃত নামক মানুষের আদি চেতনায় প্রত্যাবর্তনের সূচক। যারা বহু পাপ করেছে, বিশেষ করে পশুহত্যা অথবা বনে পশুশিকার, তাদের পক্ষে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তি পরম আবশ্যিক।

## শ্লোক ১২

আত্মানমহ্ময়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ ।

সান্ধবলঙ্কৃতসর্বাস্তো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥ ১২ ॥



আত্মানম্—স্বয়ং; অর্হ্যাম্—করা উচিত; চক্রে—করেছিলেন; ধূপ—ধূপ; আলেপ—শরীরে চন্দন-লেপন; অক্ষ—মালা; আদিভিঃ—ইত্যাদি; সাধু—সাধু, সুন্দরভাবে; অলঙ্কৃত—সজ্জিত হয়ে; সর্ব-অঙ্গঃ—সারা শরীর; মহিষ্যাম্—রাণীকে; আদধে—তিনি দিয়েছিলেন; মনঃ—মন।

### অনুবাদ

তার পর রাজা পুরঞ্জন উপযুক্ত অলঙ্কারে তাঁর দেহকে সাজিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেহে চন্দনও লেপন করেছিলেন এবং গলায় ফুলমালা ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিমুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন।

### তাৎপর্য

যখন কোন মানুষের শুভ চেতনা জাগরিত হয়, তখন তিনি কোন মহাত্মাকে তার গুরুরূপে বরণ করেন। তিনি তখন দর্শন, কাহিনী, মহান ভক্তদের আখ্যান এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে আদান-প্রদানের সমস্ত বর্ণনা থেকে বৈদিক উপদেশ শ্রবণ করেন। এইভাবে মানুষের মন নবীনতা লাভ করে, ঠিক যেভাবে কোন ব্যক্তি তার সারা শরীরে সুগন্ধ চন্দন লেপন করে এবং নিজেকে অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত করে। এই সমস্ত অলঙ্কারগুলিকে ধর্ম ও আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই প্রকার জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ বৈষয়িক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হন এবং সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণে যুক্ত হন। এই শ্লোকে সাধ্বলঙ্কৃত শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সাধুদের উপদেশের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানে মগ্ন হওয়া। সাধু ব্যক্তিদের উপদেশের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যিনি অলঙ্কৃত হয়েছেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে রাজা পুরঞ্জন যেভাবে তাঁর মহিষীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, সেইভাবে তাঁর আদি চেতনা অর্থাৎ কৃষ্ণ-চেতনার অন্বেষণ করা। সাধুদের উপদেশরূপ কৃপালাভ না করলে, কৃষ্ণ-চেতনায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিন্তিতে করিয়া ঐক্য। আমরা যদি সাধু হতে চাই, অথবা আমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভাবনায় ফিরে যেতে চাই, তা হলে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য। এটিই হচ্ছে পন্থা।



## শ্লোক ১৩

তৃপ্তো হৃষ্টঃ সুদৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ ।

ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ॥ ১৩ ॥

তৃপ্তঃ—সন্তুষ্ট; হৃষ্টঃ—আনন্দিত; সুদৃপ্তঃ—অত্যন্ত গর্বিত; চ—ও; কন্দর্প—কামদেবের দ্বারা; আকৃষ্ট—আকৃষ্ট; মানসঃ—তাঁর মন; ন—করেনি; ব্যচষ্ট—চেষ্টা; বর-আরোহাম্—উচ্চতর চেতনা; গৃহিণীম্—পত্নী; গৃহ-মেধিনীম্—যিনি তাঁর পতিকে বৈষয়িক জীবনে সন্তুষ্ট রাখেন।

## অনুবাদ

আহার করার পর তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর হৃদয়ে হর্ষ অনুভব করেছিলেন। উচ্চতর চেতনায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি কামদেবের দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর গৃহমেধী জীবনে যিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, তাঁর সেই পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন।

## তাৎপর্য

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে চান, তাঁদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গুরুদেবের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর, শিষ্য তাঁর অভ্যাসগুলির পরিবর্তন করেন এবং আমিষাহার, আসবপান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও দ্যুতক্রীড়া বর্জন করেন। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাত্ত্বিক আহার হচ্ছে অন্ন, শাক-সবজি, ফল, দুধ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। অন্ন, ডাল, চাপাটি, শাক-সবজি, দুধ, চিনি আদি সাধারণ আহার অত্যন্ত পুষ্টিকর, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, দীক্ষিত ব্যক্তির প্রসাদের নামে অত্যন্ত উপাদেয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করে। তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্য ভোজন করে। স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, কৃষ্ণভক্তির মার্গে নবীন ভক্ত যদি অত্যধিক আহার করে, তা হলে তার অধঃপতন হয়। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, সে কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তথাকথিত ব্রহ্মচারী স্ত্রীরূপ দর্শন করে বিচলিত হয়, এবং বানপ্রস্থীরা তার স্ত্রীকে সন্তোগ করার জন্য পুনরায় আকৃষ্ট হয়। অথবা সে অন্য আর একজন পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করে। ভাবের আবেগে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে সাধু ও গুরুর সঙ্গ করতে আসে, কিন্তু তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে থাকতে পারে না। কৃষ্ণভক্তির স্তরে



উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, কামদেবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার অধঃপতন হয়, এবং মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য পুনরায় দার পরিগ্রহ করে। নব্য ভক্তদের কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে জড়-জাগতিক জীবনে অধঃপতনের বর্ণনা নারদ মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) করেছেন—

তাত্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-

ভর্জনপকোহথ পতেত্ততো যদি ।

যত্র ক বাভদ্রমভূদমুখ্য কিং

কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

তা ইঙ্গিত করে যে, নবীন ভক্ত যদিও ভক্তির অপরিপক্বতাহেতু কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে অধঃপতিত হতে পারে, কিন্তু তার কৃষ্ণসেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে অথবা তথাকথিত সামাজিক বা পারিবারিক দায়দায়িত্ব সম্পাদনে যে অটল থাকে কিন্তু কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না, প্রকৃতপক্ষে তার কোন লাভ হয় না। কৃষ্ণভাবনামূলের পন্থা যিনি অবলম্বন করেছেন, তাঁর অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত এবং বর্জনীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত, যে-কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশামূলে বর্ণনা করেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্লো নিয়মাগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ নৌল্যঞ্চ ষড়ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

নবীন ভক্তের অত্যধিক আহার করা উচিত নয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করা উচিত নয়। অত্যধিক আহার করা এবং ধন সংগ্রহ করাকে বলা হয় অত্যাহার। এই প্রকার অত্যাহারের জন্য মানুষকে অত্যন্ত প্রয়াস করতে হয়। উপর-উপর তারা দেখায় যে, তারা যেন কত নিষ্ঠাসহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তাদের সংকল্প মোটেই দৃঢ় নয়। তাকে বলা হয় নিয়মাগ্রহ। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ করাকে বলা হয় জনসঙ্গ। এই প্রকার অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ করার ফলে, সাধক কাম ও লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে অধঃপতিত হয়।

### শ্লোক ১৪

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োহপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ ।

অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেন্থরীণাং যথা পুরা ॥ ১৪ ॥



অন্তঃপুর—অন্তঃপুর; দ্বিয়ঃ—স্ত্রী; অপৃচ্ছৎ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; বিমনাঃ—অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে; ইব—সদৃশ; বেদিষৎ—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি; অপি—কি; বঃ—আপনার; কুশলম্—মঙ্গল; রামাঃ—হে সুন্দরীগণ; স-ঈশ্বরীগাম্—তোমাদের অধীশ্বরী-সহ; যথা—যেমন; পুরা—পূর্বে।

### অনুবাদ

তখন রাজা পুরঞ্জন একটু উদ্ভিগ্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি অন্তঃপুরের রমণীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “হে সুন্দরীগণ! তোমাদের অধীশ্বরীর সঙ্গে তোমরা পূর্বের মতো কুশলে আছ তো?”

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে বেদিষৎ শব্দটি মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে ইঙ্গিত করছে। কেউ যখন ভগবন্তের সঙ্গে প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর কৃষ্ণভক্তিকে জাগরিত করেন, তখন তিনি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মনের এই কার্যকলাপগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, এবং স্থির করেন যে, তিনি কি জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে যাবেন, না আধ্যাত্মিক চেতনায় অটল থাকবেন। কুশলম্ শব্দটি মঙ্গলের সূচক। কেউ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর গৃহ সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ যখন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, অর্থাৎ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন সে সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য তার মনের সঙ্গে পরামর্শ করা, এবং চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা—মনের এই সমস্ত কার্যকলাপগুলিকে কিভাবে সদ্যবহার করা যায় তা স্থির করা। কেউ যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কিভাবে তাঁর সেবা করবেন সেই কথা ভাবেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর বুদ্ধির সদুপদেশ গ্রহণ করছেন, যাকে বলা হয় মাতা। যদিও রাজার শান্তি দূর হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁর পত্নীর খোঁজ করছিলেন। এইভাবে তিনি পরামর্শ করছিলেন, চিন্তা করছিলেন এবং ইচ্ছা করছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর উত্তম চেতনায় ফিরে যেতে পারেন। মন পরামর্শ দিতে পারে যে, বিষয়-ভোগের ফলে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্তির মার্গে অগ্রসর হয়েছেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সুখভোগ করার চেষ্টা করেন না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥



“জীবাত্মা বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু কেউ যখন উচ্চতর রস আস্থাদান করে নিম্নতর বিষয়ের কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন তার চেতনা স্থির হয়।” ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, বিষয়-ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না। পরং দৃষ্টা নিবর্ততে। কেউ যখন বাস্তবিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে পারেন।

### শ্লোক ১৫

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ ।

যদি ন স্যাৎ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা ।

ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; তথা—পূর্বের মতো; এতর্হি—এখন; রোচন্তে—রুচিকর; গৃহেষু—গৃহে; গৃহ-সম্পদঃ—গৃহের সমস্ত সম্পদ; যদি—যদি; ন—না; স্যাৎ—হয়; গৃহে—গৃহে; মাতা—মাতা; পত্নী—পত্নী; বা—অথবা; পতি-দেবতা—পতিপরায়ণ; ব্যঙ্গে—চক্রবিহীন; রথে—রথে; ইব—সদৃশ; প্রাজ্ঞঃ—বিদ্বান ব্যক্তি; কঃ—কে; নাম—বাস্তবিকপক্ষে; আসীত—বসবে; দীন-বৎ—দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তির মতো।

### অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন বললেন—আমি বুঝতে পারছি না আমার গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পূর্বের মতো আমাকে আর কেন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, গৃহে যদি মাতা ও পতিপরায়ণা পত্নী না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চক্রবিহীন রথের মতো। কোন্ মূর্খ সেই অচল রথে উপবেশন করবে?

### তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

“যার গৃহে মাতা নেই এবং পত্নী অপ্রিয়-ভাষিনী, তার গৃহত্যাগ করে বনে যাওয়াই কর্তব্য, কারণ তার গৃহ অরণ্যসদৃশ।” প্রকৃত মাতা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি এবং প্রকৃত



পত্নী হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবানের সেবায় তাঁর পতিকে সহায়তা করেন। সুখী গৃহের জন্য এই দুটি বস্তু অত্যন্ত আবশ্যিক।

প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের শক্তি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পিছনে রয়েছেন হয় তাঁর মাতা অথবা পত্নী। ঘরে যদি সুশীলা পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা থাকেন, তা হলে গৃহস্থ জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই অবস্থায় গৃহস্থলির সমস্ত কার্যকলাপ এবং সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম অত্যন্ত সুখদায়ক হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্নেহময়ী মাতা এবং সুশীলা পত্নী দুই ছিল, এবং তিনি তাঁর গৃহে অত্যন্ত সুখী ছিলেন, তবুও সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গৃহে পূর্ণরূপে সুখী হতে হলে, স্নেহময়ী মাতা ও পত্নী উভয়েরই আবশ্যিক। তা না হলে, গৃহস্থ-জীবনের কোন অর্থ থাকে না। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ধর্মপরায়ণ হয়ে ভগবানে ভক্তি না করলে, সাধু ব্যক্তির কাছে তাঁর সেই গৃহ কখনই সুখকর হতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, গৃহে যদি স্নেহময়ী মাতা ও সুশীলা পত্নী থাকে, তা হলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যিকতার জন্যই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন।

### শ্লোক ১৬

ক্ব বর্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্গবে ।

যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥ ১৬ ॥

ক্ব—কোথায়; বর্ততে—অবস্থান করছে; সা—সেই; ললনা—রমণী; মজ্জন্তম্—নিমজ্জিত হওয়ার সময়; ব্যসন-অর্গবে—বিপদের সমুদ্রে; যা—যে; মাম্—আমাকে; উদ্ধরতে—উদ্ধার করে; প্রজ্ঞাম্—সদ্বুদ্ধি; দীপয়ন্তী—আলোকে উদ্ভাসিত করে; পদে পদে—প্রতি পদে।

### অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বল, বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে, যে আমাকে সর্বদা উদ্ধার করে, সেই সুন্দরী ললনা কোথায় অবস্থান করছে? প্রতি পদে আমাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করে সে সর্বদা আমাকে রক্ষা করে।



## তাৎপর্য

সুশীলা পত্নী ও সদবুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাঁর সদবুদ্ধি রয়েছে, তিনি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে পারেন এবং বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। এই সংসারে প্রতিপদে বিপদ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—পদং পদং যদিপদাং ন তেষাম্। এই জড় জগৎ প্রকৃতপক্ষে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা ভগবদ্ভক্তের থাকার উপযুক্ত স্থান নয়, কারণ এখানে প্রতি পদে বিপদ রয়েছে। বৈকুণ্ঠ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃত আলয়, কারণ সেখানে কোন উৎকর্ষা নেই এবং বিপদ নেই। সদবুদ্ধি মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা লাভ করা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ না হলে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না।

এখানে আমরা দেখছি যে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুশীলা পত্নীর অন্বেষণ করছিলেন, যিনি এই জড় জগতের সমস্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সর্বদা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, প্রকৃত পত্নী হচ্ছেন ধর্মপত্নী। অর্থাৎ, ধর্ম অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন স্ত্রীকে অঙ্গীকার করা হয়, তখন তাঁকে বলা হয় ধর্মপত্নী। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মপত্নী থেকে উৎপন্ন সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু অবিবাহিতা পত্নী থেকে উৎপন্ন সন্তানের পিতার সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। ধর্মপত্নী শব্দটি পতিব্রতা পত্নীকেও বোঝায়। পতিব্রতা পত্নী হচ্ছেন তিনি, যাঁর বিবাহের পূর্বে কোন পুরুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। স্ত্রীদের যদি যৌবনে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তা হলে তার সতীত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়। সাধারণত তাদের সতীত্ব থাকে না। আগুনের সামনে মাখন আনলে তা গলবেই। স্ত্রী হচ্ছে আগুনের মতো এবং পুরুষ মাখনের মতো। কিন্তু কেউ যদি ধর্ম অনুসারে বিবাহের মাধ্যমে পতিব্রতা স্ত্রী প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি তাঁকে জীবনের বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার পত্নী সমস্ত সদবুদ্ধির উৎস হতে পারেন। এই প্রকার সুশীলা পত্নীসহ সমস্ত পরিবার যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সেই গৃহ গৃহস্থ-আশ্রমে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৭ .

রামা উচুঃ

নরনাথ ন জানীমন্তুৎপ্রিয়া যদ্যবস্যাতি ।

ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্ ॥ ১৭ ॥



রামাঃ উচুঃ—সেই রমণীরা বললেন; নর-নাথ—হে রাজন; ন জানীমঃ—আমরা জানি না; ত্বৎ-প্রিয়া—আপনার প্রিয়া; যৎ ব্যবস্যাতি—কেন এই প্রকার জীবন অবলম্বন করেছেন; ভূ-তলে—মাটিতে; নিরবস্তারে—শয্যাবিহীন; শয়ানাম্—শয়ন করেছেন; পশ্য—দেখুন; শত্রু-হন্—হে শত্রু-হত্যাকারী।

### অনুবাদ

সেই রমণীরা তখন রাজাকে বললেন—হে নরনাথ! আপনার স্ত্রী যে কেন এইভাবে অবস্থান করছেন, তা আমরা জানি না। হে শত্রুহন্! দয়া করে দেখুন! বিনা শয্যায় তিনি ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন। তিনি যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

### তাৎপর্য

মানুষ যখন বিযুক্তভক্তি রহিত হয়, তখন সে বহু পাপকর্মে লিপ্ত হয়। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীকে উপেক্ষা করে গৃহত্যাগ করে পশুহত্যা লিপ্ত হয়েছিলেন। এটি হচ্ছে সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের অবস্থা। তারা বিবাহিতা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি যত্নবান হয় না। তারা পত্নীকে ভগবদ্ভক্তি সাধনের অবলম্বন বলে মনে না করে, তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের একটি যন্ত্র বলে মনে করে। অসংযত যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে। তারা স্থির করেছে যে, কিছু পয়সা দিয়ে যে-কোন স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সুখ উপভোগ করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পস্থা, যেন স্ত্রীলোকেরা হচ্ছে বাজারের পণ্যদ্রব্য। তাই এই সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ উপার্জন করার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রমে তাদের শক্তি ক্ষয় করে। এই প্রকার জড়বাদী মানুষেরা তাদের শুভ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের হৃদয়ে সেই বুদ্ধির অন্বেষণ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। ধর্ম-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে-ব্যক্তি পতিব্রতা পত্নী লাভ করেনি, তার বুদ্ধি সর্বদাই বিভ্রান্ত।

মহারাজ পুরঞ্জনের পত্নী ভূতলে শয়ন করেছিলেন কারণ তাঁর পতি তাঁকে অবহেলা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পতির কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা স্ত্রীকে রক্ষা করা। আমরা সব সময় বলি যে, লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষে অবস্থিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পত্নীকে তাঁর পতির আলিঙ্গনে থাকা কর্তব্য। তার ফলে তিনি তাঁর পতির প্রেমে ধন্য হন এবং তাঁর কাছে সুরক্ষিত থাকেন। মানুষ যেমন তার ধন সঞ্চয় করে ব্যক্তিগতভাবে তা রক্ষা করেন, তেমনই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পত্নীকে নিজের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত রাখা। বুদ্ধি যেমন সর্বদা হৃদয়ের অভ্যন্তরে



থাকে, তেমনই পতির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে সর্বদা তাঁর বক্ষে রাখা। সেটিই হচ্ছে পতি-পত্নীর আদর্শ সম্পর্ক। তাই পত্নীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। এক পা, এক হাত অথবা শরীরের অর্ধঅঙ্গ নিয়ে কেউ থাকতে পারে না। তাঁর উভয় অঙ্গই প্রয়োজন। তেমনই, প্রকৃতির নিয়মে, পতি ও পত্নীর একত্রে থাকা উচিত। নিম্নতর যোনিতে, পক্ষী ও পশুসমাজে দেখা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মে পতি-পত্নী একত্রে বাস করে। এইভাবে মানব-জীবনেও পতি ও পত্নীর একসাথে বাস করাই আদর্শ জীবন। গৃহটি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্থান হওয়া উচিত, এবং পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতিব্রতা হয়ে ধর্ম অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। এইভাবে মানুষ তার গৃহে সুখী হতে পারে।

### শ্লোক ১৮

নারদ উবাচ

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরীক্ষ্যাবধূতাং ভুবি ।

তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ ॥ ১৮ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; পুরঞ্জনঃ—রাজা পুরঞ্জন; স্ব-মহিষীম্—তাঁর রাণীকে; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; অবধূতাম্—অবধূতের মতো; ভুবি—ভূমির উপর; তৎ—তাঁর; সঙ্গ—সঙ্গে; উন্মথিত—অনুপ্রাণিত; জ্ঞানঃ—যার জ্ঞান; বৈক্লব্যম্—ব্যাকুল; পরমম্—পরম; যযৌ—হয়েছিলেন।

### অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীকে অবধূতের মতো ভূতলে পতিতা দেখে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে অবধূতাম্ শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা দেহের প্রতি উদাসীন তপস্বীকে বোঝায়। রাণীকে আলুলায়িত বেশে শয়্যাবিহীন ভূমিতে শায়িত দেখে, রাজা পুরঞ্জনের অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি যে তাঁকে অবহেলা করে বনে পশুবধ করতে গিয়েছিলেন, সেই জন্য তাঁর অনুতাপ হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষ যখন তার শুভ বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা শুভ বুদ্ধিকে অবহেলা করে, তখন সে পূর্ণরূপে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। শুভ বুদ্ধি বা কৃষ্ণভাবনামৃতকে অবহেলা করার ফলে, মানুষ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়।



মানুষ যখন সেই কথা বুঝতে পারে, তখন সে অনুতপ্ত হয়। এই প্রকার অনুতাপের বর্ণনা করে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু ।  
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,  
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

কৃষ্ণভক্তির পস্থা অবলম্বন না করা, জেনে শুনে বিষপান করারই মতো। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, মানুষ যখন তার সুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে হারায়, অর্থাৎ সে যখন তার শুভ বুদ্ধি হারিয়ে কৃষ্ণভক্তির পস্থা অবলম্বন করে না, তখন সে নিশ্চিতভাবে পাপকর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে।

### শ্লোক ১৯

সান্ত্বয়ন্ শ্লঙ্কয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা ।  
প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরন্তলিঙ্গমাত্মনি নাভ্যাগাৎ ॥ ১৯ ॥

সান্ত্বয়ন্—সান্ত্বনা দিয়ে; শ্লঙ্কয়া—মধুর; বাচা—বাক্যের দ্বারা; হৃদয়েন—হৃদয়ের দ্বারা; বিদূয়তা—অত্যন্ত অনুতাপ করে; প্রেয়স্যাঃ—তাঁর প্রেয়সীর; স্নেহ—স্নেহ থেকে; সংরন্ত—ক্রোধের; লিঙ্গম্—লক্ষণ; আত্মনি—তাঁর হৃদয়ে; ন—করেনি; অভ্যাগাৎ—উখিত হয়েছিল।

### অনুবাদ

দুঃখিত অন্তরে, রাজা তাঁর পত্নীকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও তাঁর অন্তর অনুশোচনায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রণয়জনিত কোপের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

### তাৎপর্য

রাজা তাঁর মহিষীকে ত্যাগ করে পাপকর্ম করার উদ্দেশ্যে বনে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তি ও শুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হন, তখন তাঁর জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বার খুলে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—  
পরানুভবস্তাবদবোধিজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্। মানুষ যখন তার কৃষ্ণচেতনা



হারায় এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতি আর আগ্রহ থাকে না, তখন তার পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া অবশ্যস্তাবী। কৃষ্ণভাবনা-বিহীন সমস্ত কার্যকলাপই জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্য-জীবনে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এই পন্থার দ্বারাই কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

### শ্লোক ২০

অনুনির্যোহা শনকৈবীরোহনুনয়কোবিদঃ ।

পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ॥ ২০ ॥

অনুনির্যো—অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করেছিলেন; অথ—এইভাবে; শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; বীরঃ—বীর; অনুনয়-কোবিদঃ—অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ; পস্পর্শ—স্পর্শ করে; পাদ-যুগলম্—পদযুগল; আহ—তিনি বলেছিলেন; চ—ও; উৎসঙ্গ—ক্রোড়ে; লালিতাম্—আলিঙ্গন করেছিলেন।

### অনুবাদ

অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ রাজা ধীরে ধীরে তাঁর মহিষীকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পদযুগল স্পর্শ করেছিলেন, তারপর তাঁকে তাঁর ক্রোড়ে স্থাপন করে, গভীর আবেগে আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং তাঁকে এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

### তাৎপর্য

মানুষকে প্রথমে তার পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করে, তার কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে হয়। রাজা পুরঞ্জন যেভাবে তাঁর মহিষীর কাছে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে পূর্বের মতো আর ভগবদ্ধিমুখ কার্যকলাপ না করার সংকল্প করে, কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে, প্রণতি নিবেদন করতে হয়। নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা কখনই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না। তাই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর চরণ-কমল স্পর্শ করতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন—

নৈবাং মতিস্তাবদুরক্রমাঙ্ঘ্রিৎ

স্পৃশত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ ।



মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৩২)

মহাত্মা বা মহান ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ না করা পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এটিই হচ্ছে শরণাগতির শুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চান যে, সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয়, এবং এই শরণাগতির পন্থার শুরু হয় যখন মানুষ সদগুরুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করে। নিষ্ঠা সহকারে সদগুরুর সেবা করার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তিময় পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় জগতে নিজের পদগর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করা। যারা এই জড় জগতে তাদের উচ্চ পদের জন্য বৃথা গর্বিত হয়—যেমন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা—তারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। তারা সব কিছুর পরম কারণকে জানে না। যদিও তারা মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু তারা সেই ব্যক্তির শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে চায় না, যিনি সব কিছু সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনও কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করা যায় না। সেই জন্য অবশ্যই সদগুরুর শরণাগত হতে হয়। সেটিই হচ্ছে এক মাত্র পন্থা।

শ্লোক ২১

পুরঞ্জন উবাচ

নুনং ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেষীশ্বরাস্তে শুভে ।

কৃতাগঃস্বাত্মসাৎকৃত্বা শিক্ষাদগুং ন যুঞ্জতে ॥ ২১ ॥

পুরঞ্জনঃ উবাচ—পুরঞ্জন বললেন; নুনম্—নিশ্চিতভাবে; তু—তা হলে; অকৃত-পুণ্যঃ—যারা পুণ্যবান নয়; তে—সেই প্রকার; ভৃত্যঃ—সেবকেরা; যেষু—থাকে; ঈশ্বরাস্তে—প্রভুগণ; শুভে—হে কল্যাণী; কৃত-আগঃসু—অপরাধ করে; স্বাত্মসাৎ—নিজের বলে গ্রহণ করা; কৃত্বা—তা করে; শিক্ষা—শিক্ষণীয়; দগুং—দণ্ড; ন যুঞ্জতে—দেয় না।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন বললেন—হে কল্যাণী! প্রভু যখন তাঁর ভৃত্যকে নিজের লোক বলে মনে করেন, কিন্তু তার অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড দেন না, তখন সেই ভৃত্য অবশ্যই মন্দভাগ্য।



### তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় গৃহপালিত পশু ও ভূতাদের নিজের সন্তানের মতো বলে মনে করা হয়। পশু ও শিশুদের অনেক সময় দণ্ড দেওয়া হয়। সেই দণ্ড প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাব নিয়ে দেওয়া হয় না, অনুরাগবশত দেওয়া হয়। তেমনই প্রভু কখনও কখনও ভূতাকে দণ্ড দেন, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়, পক্ষান্তরে তার প্রতি অনুরাগবশত তাকে সংশোধন করার জন্য। এইভাবে পুরঞ্জন তাঁর প্রতি তাঁর মহিষীর দণ্ডকে তাঁর কৃপা বলে মনে করেছিলেন। তিনি নিজেকে রানীর সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মহিষী তাঁর পাপকর্মের জন্য, অর্থাৎ তাঁকে গৃহে ফেলে রেখে বনে মৃগয়ায় যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি কুপিতা হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন সেই দণ্ডকে তাঁর পত্নীর প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ বলে মনে করেছিলেন। তেমনই, কেউ যখন প্রকৃতির নিয়মে, ভগবানের ইচ্ছায় দণ্ডিত হয়, তখন বিচলিত হওয়া উচিত নয়। সেটি হচ্ছে প্রকৃত ভক্তের বিচার। ভক্ত যখন কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়েন, তখন তিনি সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন।

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদাধ্বপুর্ভির্বিদধমমস্তে

জীবৈত যো মুক্তিপদে স দায়তাক্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৮)

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু কৃপাপূর্বক ভগবান তাঁর দণ্ডকে লাঘব করে দিয়েছেন, এবং তাই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে অধিকতর প্রার্থনা ও প্রণতি নিবেদন করেন। কারও অপরাধের জন্য যদি রাষ্ট্র অথবা ভগবান তাকে দণ্ড দেন, তা হলে সেটি তার পক্ষে লাভজনক। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, রাজা যখন হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন সেই রাজাকে দয়ালু বলে মনে করা উচিত কেননা হত্যাকারী এই জীবনে দণ্ডভোগ করে তার পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তী জীবনে নিষ্পাপরূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রভুর দেওয়া দণ্ডকে কেউ যদি পুরস্কার বলে মনে করেন, তা হলে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কখনও সেই ভুল করেন না।



শ্লোক ২২

পরমোহনুগ্রহো দণ্ডো ভূত্যেষু প্রভুণাপিতঃ ।

বালো ন বেদ তত্ত্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

পরমঃ—পরম; অনুগ্রহঃ—কৃপা; দণ্ডঃ—দণ্ড; ভূত্যেষু—ভূত্যদের উপর; প্রভুণা—প্রভুর দ্বারা; অপিতঃ—প্রদত্ত; বালঃ—মূর্খ; ন—করে না; বেদ—জানা; তৎ—তা; তন্নি—হে কৃশাঙ্গী; বন্ধু কৃত্যম্—বন্ধুর কর্তব্য; অমর্ষণঃ—ক্রুদ্ধ।

অনুবাদ

হে কৃশাঙ্গী! প্রভু যখন ভূত্যকে দণ্ড দেন, তখন ভূত্যের কর্তব্য হচ্ছে তা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করা। যে ভূত্য তাতে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অজ্ঞ; কারণ সে জানে না যে, সেটিই হচ্ছে বন্ধুর কর্তব্য।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মূর্খকে যদি সদুপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। উন্টে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধকে সাপের বিষের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ সাপকে যখন দুধকলা খাওয়ানো হয় তখন তার বিষ বৃদ্ধি পায়। সাপকে ভাল ভাল খাদ্য খেতে দিলে, দয়ালু ও বিন্দ্র হওয়ার পরিবর্তে সাপের বিষ বৃদ্ধি পায়। তেমনি, মূর্খকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন সে নিজেকে সংশোধন করার পরিবর্তে ক্রুদ্ধ হয়।

শ্লোক ২৩

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্রুরাগভার-

ব্রীড়াবিলম্ববিলসন্ধিসিতাবলোকম্ ।

নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ

স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্লুবাক্যম্ ॥ ২৩ ॥

সা—সেই (তুমি, আমার পত্নী); ত্বম্—তুমি; মুখম্—তোমার মুখ; সুদতি—হে সুদশনে; সুভ্রু—সুন্দর ভ্রূসমষ্টি; অনুরাগ—আসক্তি; ভার—ভার; ব্রীড়া—স্ত্রীসুলভ লজ্জা; বিলম্ব—বিলম্বিত; বিলসৎ—উজ্জ্বল; হসিত—হাস্য; অবলোকম্—কটাক্ষ; নীল—নীল; অলক—কেশযুক্ত; অলিভিঃ—ভ্রমরের মতো; উপস্কৃতম্—ভূষিত; উন্নসম্—উন্নত নাসিকা; নঃ—আমাকে; স্বানাম্—যে তোমার; প্রদর্শয়—দেখাও; মনস্বিনি—হে মনস্বিনী; বল্লু-বাক্যম্—মধুর বাক্যের দ্বারা।



### অনুবাদ

হে প্রিয়ে, হে সুদশনে! তোমার আকর্ষণীয় কার্যকলাপের ফলে, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীল বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে তোমার এই ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও, এবং অনুরাগ ভরে একটু হাস। তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন আমি তোমার মুখুর হাসি দর্শন করি, এবং তোমার ঘন নীল সুন্দর কেশদাম ও তোমার উন্নত নাসিকা দর্শন করি এবং তোমার মধুর বাক্যালাপ শ্রবণ করি, তখন তুমি আমার কাছে আরও অধিক সুন্দর হয়ে ওঠ এবং তার ফলে তুমি আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ কর এবং কৃতার্থ কর। তুমি হচ্ছে আমার পরম আদরিণী প্রিয়তমা।

### তাৎপর্য

স্ত্রেণ পতি তার পত্নীর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, তার আজ্ঞাকারী দাস হতে চায়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন একটা রক্ত ও মাংসের পিণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট না হই। একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এক সময় কোন পুরুষ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে, তার কাছে এমনভাবে প্রেম নিবেদন করে যে, তখন সেই রমণীটি তার সৌন্দর্যের উপাদানগুলি তাকে দেখাবার এক পরিকল্পনা করে। সে সেই পুরুষটিকে একটি নির্দিষ্ট দিনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে, এবং ইতিমধ্যে সে জোলাপ নিয়ে দিনরাত কেবল মলত্যাগ করতে থাকে, এবং সেই মল সে একটি পাত্রে সংগ্রহ করে রাখে। পরের দিন রাত্রে সেই পুরুষটি যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন সেই সুন্দরী রমণীর পরিবর্তে সে এক রুগ্ন কুৎসিত স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল, সেই সুন্দরী রমণীটি কোথায়, তখন সে উত্তর দেয়, “আমিই সেই রমণী।” তার সেই কথায় পুরুষটির বিশ্বাস হয়নি। তীব্র জোলাপের প্রভাবে যে তার সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে, তা সে বুঝতে পারেনি। পুরুষটি যখন তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকে, তখন রমণীটি বলে যে, সে তার সৌন্দর্যের উপাদানগুলি আলাদা করে রেখে দিয়েছে বলে, তাকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। পুরুষটি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, তার থেকে তার সৌন্দর্য আলাদা হওয়া কি করে সম্ভব, তখন রমণীটি বলে, “আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে দেখাব।” এইভাবে সে তখন তাকে তরল দাস্ত ও বমিতে পূর্ণ সেই পাত্রটি দেখায়। এইভাবে পুরুষটি তখন বুঝতে পারে যে, সেই সুন্দরী রমণীটি কেবল রক্ত, মল, মূত্র আদি ঘৃণ্য সমস্ত উপাদানের একটি পিণ্ড



মাত্র। এটিই হচ্ছে বাস্তব সত্য, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মায়িক সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়।

রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পূর্বসৌন্দর্য প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক যেভাবে জীব তার আদি চেতনা বা কৃষ্ণ-চেতনা পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করে, যা অত্যন্ত সুন্দর। কৃষ্ণভক্তির সুন্দর অঙ্গের সঙ্গে মহিষীর সমস্ত সুন্দর অঙ্গের তুলনা করা যেতে পারে। কেউ যখন তাঁর মূল কৃষ্ণ-চেতনায় ফিরে যায়, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাপরায়ণ হন, এবং তাঁর জীবন তখন সার্থক হয়।

### শ্লোক ২৪

তস্মিন্দধে দমমহং তব বীরপত্নি

যোহন্যত্র ভূসুরকুলাৎকৃতকিল্বিষস্তম্ ।

পশ্যো ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা-

মন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্—তাকে; দধে—দেব; দমম্—দণ্ড; অহম্—আমি; তব—তোমাকে; বীর-পত্নি—হে বীরের পত্নী; যঃ—যে; অন্যত্র—অন্যথা; ভূ-সুর-কুলাৎ—এই পৃথিবীতে দেবতাদের কুল থেকে (ব্রাহ্মণ); কৃত—অনুষ্ঠিত; কিল্বিষঃ—অপরাধ; ত্বম্—তাকে; পশ্যো—আমি দেখি; ন—না; বীত—ব্যতীত; ভয়ম্—ভয়; উন্মুদিতম্—উৎকণ্ঠা-রহিত; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবনে; অন্যত্র—অন্য কোথাও; বৈ—নিশ্চিতভাবে; মুর-রিপোঃ—মুর নামক অসুরের শত্রু (কৃষ্ণের); ইতরত্র—পক্ষান্তরে; দাসাৎ—ভূতা অপেক্ষা।

### অনুবাদ

হে বীরপত্নী! আমাকে তুমি বল কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? সেই ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত না হন, তা হলে আমি তাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবক ব্যতীত, এই ত্রিলোকে আমি অন্য আর কাউকে ক্ষমা করব না। তোমার চরণে অপরাধ করে কেউই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে না, কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড দণ্ডদান করব।



### তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় ব্রাহ্মজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণ এবং মুর নামক অসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত রাষ্ট্রের আইনের অতীত অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যদি রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করেন, তবুও তাঁরা দণ্ডনীয় নন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা কখনও রাষ্ট্রের অথবা প্রকৃতির আইন অমান্য করেন না, কারণ তাঁরা এইভাবে আইন ভঙ্গ করার পরিণতি খুব ভালভাবেই জানেন। যদিও কখনও কখনও মনে হতে পারে যে, তাঁরা আইন ভঙ্গ করেছেন, তবুও তাঁরা দণ্ডনীয় নন। নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে সেই উপদেশ দিয়েছেন। রাজা পুরঞ্জন ছিলেন রাজা প্রাচীনবর্হিষতের প্রতীক, এবং নারদ মুনি রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে তাঁর পূর্বপুরুষ পৃথু মহারাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি কখনও ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবকে দণ্ডদান করেননি।

মানুষের শুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধ কৃষ্ণ-চেতনা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রভাবে দূষিত হয়ে যেতে পারে। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, পুণ্যকর্ম ইত্যাদির দ্বারা শুদ্ধ চেতনাকে জাগরিত করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করার ফলে কৃষ্ণচেতনা যখন দূষিত হয়ে যায়, তখন তা পুনর্জাগরিত করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব অপরাধকে ‘হাতী মাতা’ অপরাধ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পাগলা হাতি কোন বাগানে ঢুকলে যেমন বাগানটি তচনচ হয়ে যায়, তেমনি বৈষ্ণব অপরাধের ফলে ভক্তিলতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। বৈষ্ণব মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করার ফলে মহাযোগী দুর্বাসাও সুদর্শন চক্রের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, যদিও মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহস্থ। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন বৈষ্ণব, এবং তাই তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে, দুর্বাসা মুনিকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল।

মূল কথা হচ্ছে যে, কৃষ্ণ-চেতনা যদি জড়-জাগতিক পাপকর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তা হলে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সেই পাপ দূর করা যায়, কিন্তু কারও কৃষ্ণ-চেতনা যদি ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার ফলে কলুষিত হয়ে যায়, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করে এবং তার প্রসন্নতা-বিধান করে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কৃষ্ণচেতনা পুনর্জাগরিত করা যায় না। দুর্বাসা মুনিকে সেই পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছিল—তাঁকে মহারাজ অম্বরীষের শরণাগত হতে হয়েছিল। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা করা ছাড়া, অন্য কোন উপায়ে বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।



শ্লোক ২৫

বভ্রুং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং  
সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্ ।  
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ  
বিস্বাধরং বিগতকুঙ্কমপঙ্করাগম্ ॥ ২৫ ॥

বভ্রুং—মুখ; ন—কখনই না; তে—তোমার; বিতিলকম্—অলঙ্কার-বিহীন;  
মলিনম্—মলিন; বিহর্ষম্—বিষম্ভ; সংরম্ভ—ক্রোধে; ভীমম্—ভয়ঙ্কর; অবিমৃষ্টম্—  
কান্তিহীন, অপেত-রাগম্—অনুরাগশূন্য; পশ্যে—আমি দেখেছি; স্তনৌ—তোমার স্তন  
যুগল; অপি—ও; শুচা-উপহতৌ—অশ্রুসিক্ত; সু-জাতৌ—অত্যন্ত সুন্দর; বিস্ব-  
অধরম্—রক্তিম অধর; বিগত—রহিত; কুঙ্কম-পঙ্ক—কেশর; রাগম্—রং।

অনুবাদ

প্রিয়ে! ইতিপূর্বে আমি তোমার মুখ কখনও তিলকবিহীন দেখিনি, এই রকম  
বিষম্ভ, অনুজ্জ্বল ও স্নেহশূন্য মুখ কখনও দর্শন করিনি। তোমার সুন্দর স্তনযুগল  
আমি কখনও অশ্রুসিক্ত দেখিনি, এবং বিশ্বফলের মতো রক্তিম তোমার অধর  
এইভাবে রক্তিম আভাশূন্য হতে ইতিপূর্বে আমি কখনই দেখিনি।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা যখন তিলক ও সিঁদুরের দ্বারা ভূষিতা থাকেন, তখন তাঁদের খুব সুন্দর  
দেখায়। তাঁদের ঠোঁট যখন কেশর ও তাম্বুলের রাগে রক্তিম হয়ে ওঠে, তখন  
তা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি যখন উজ্জ্বল  
কৃষ্ণচেতনা-বিহীন হয়, তখন তা এতই বিষম্ভ ও কান্তিহীন হয়ে যায় যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি  
থাকা সত্ত্বেও তা থেকে কোন লাভ হয় না।

শ্লোক ২৬

তন্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিন্বিষস্য  
স্বৈরং গতস্য যুগয়াং ব্যসনাতুরস্য ।  
কা দেবরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-  
বিস্রম্ভপৌংস্রমুশতী ন ভজেত কৃত্যে ॥ ২৬ ॥



তৎ—অতএব; মে—আমার প্রতি; প্রসীদ—প্রসন্ন হও; সু-হৃদঃ—অন্তরঙ্গ বন্ধু; কৃত-কিল্বিষস্য—পাপকর্ম করার ফলে; স্বৈরম্—স্বতন্ত্রভাবে; গতস্য—যে গিয়েছিল; মৃগয়াম্—শিকার করতে; ব্যাসন—আতুরস্য—পাপপূর্ণ বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; কা—কোন্ স্ত্রী; দেবরম্—পতি; বশ-গতম্—তার বশীভূত; কুসুম-অস্ত্র-বেগ—কামদেবের বাণের দ্বারা বিদ্ধ; বিস্রস্ত—বিক্ষিপ্ত; পৌৎসল্যম্—দৈর্ঘ্য; উশতী—অত্যন্ত সুন্দর; ন—কখনই না; ভজেত—ভজনা করবে; কৃত্যে—যথাযথ কর্তব্য অনুসারে।

### অনুবাদ

হে রানী! আমার পাপপূর্ণ বাসনার ফলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। তবুও আমাকে তোমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলে মনে করে, আমার ত্রুটি মার্জনা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বাস্তবিকপক্ষে আমি অত্যন্ত দুঃখী, কিন্তু কামদেবের বাণের আঘাতে আমি অত্যন্ত কামার্ত হয়েছি। কোন্ সুন্দরী রমণী তার কামুক পতিকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করবে?

### তাৎপর্য

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরস্পরকে চায়; এটিই হচ্ছে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ভিত্তি। স্ত্রীলোকেরা সর্বদা সুন্দরভাবে নিজেদের সাজায়, যাতে তারা তাদের কামার্ত পতিদের আকৃষ্ট করতে পারে। কামার্ত পতি যখন পত্নীর কাছে আসে, তখন পত্নী তার আক্রমণাত্মক আচরণ উপভোগ করে। স্ত্রীলোকেরা যখন পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত, তা সে তার পতি হোক অথবা অন্য কোন পুরুষ হোক, অত্যন্ত কামুক হওয়ার ফলে তারা সেই আক্রমণ উপভোগ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যখন বুদ্ধির যথাযথ সদ্যবহার হয়, তখন বুদ্ধি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়েই গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্  
কণ্ডুয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।

কর্মীদের প্রকৃত সুখ হচ্ছে যৌন জীবন। তারা গৃহের বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং সেই পরিশ্রমের তৃপ্তিসাধনের জন্য তারা গৃহে ফিরে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। রাজা পুরঞ্জন বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন, এবং কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কোন মানুষ যদি গৃহ থেকে দূরে থেকে কোন শহরে বা অন্য কোথাও সপ্তাহব্যাপী কার্য করে, তা



হলে সপ্তাহ অন্তে সে গৃহে ফিরে তার পত্নীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে—  
যম্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্ । কর্মীরা কেবল মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে। আধুনিক মানব-সমাজ বিভিন্নভাবে অসংযত যৌন জীবন উপভোগ করার উপায় উদ্ভাবন করে, সেটিকে তাদের উন্নতি বলে মনে করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ‘পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ’ নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য।